শিক্ষা কমিশন-২০০৯

এম আর খায়রুল উমাম

দেশে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার কাজ শিক্ষা কমিশন দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, এ মাসের মধ্যে কমিশন তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেবে। ইতোমধ্যে শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেছে। এখন খসড়ার ওপর মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। একটা দ্রুত সময়ের মধ্যে কমিশন জনগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সাধুবাদযোগ্য কাজ করেছেন। কমিশনের সদস্যদের শ্রম সার্থক হোক, দেশের মানুষের জন্য সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষা নীতির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হোক। এত আশার মধ্যে ভয়টাও কম না। মানুষ বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত ৯টা শিক্ষা কমিশনের কার্যক্রম দেখলেও তার কোন বাস্তবায়ন দেখেনি। অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় কমিশন সদস্যদের শ্রম ব্যর্থ হলে, ৯টার জায়গায় ১০টা কমিশন ব্যর্থ হলো ভেবে পুলকবোধ করা যাবে। কিন্তু দেশের মানুষ শিক্ষানীতিহীন ভাবে আর কতদিন চলবে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শিক্ষানীতি নিয়ে কোন আলোচনার মধ্যে যাব না বলে ঠিক করে নিয়েছিলাম। যা আলোর মুখ দেখার কোন সম্ভাবনা নেই তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা সময় নষ্ট করার শামিল। কমিশনের সদস্য হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করে থাকেন তারা হয়তো মানুষের কল্যাণে চিন্তা করে সময় দিয়ে যান। বারবার সময় দিতে গিয়ে এই বিখ্যাত মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন না বা বিব্রতবোধও করেন না। জনগণের অর্থ ব্যয় করে স্বাধীনতার পর থেকে সমানে একাজ করে চলার কারণ কি ? এমন একটা কমিশনের প্রতিবেদন তৈরি করতে আনুমানিক কত অর্থের প্রয়োজন পড়ে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকার কারণে মোট অর্থ অপচয়ের পরিমাণ ধারণা করতে পারি না। তবে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধারণা করি খুব একটা খারাপ পরিমাণ অর্থ শিক্ষা কমিশনের পেছনে ব্যয় হয়নি। জবাবদিহিতা না থাকার কারণে এখনও কাউকে সাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়াতে হয়নি, তবে হবে না এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। একটা গরিব দেশের মানুষের ওপর এমন করের বোঝা চাপানো ঠিক হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্টদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

বর্তমান শিক্ষা কমিশনে সরকার যে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সমাহার ঘটিয়েছে তা মানুষকে আশাবাদী করে তুলেছে। এবার অন্তত ডার্করুমে গিয়ে হারিয়ে যাবে না। যদিও সরকারের একান্ত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না হারানোর ব্যাপারটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর শামসুল হকের শিক্ষা কমিশন মাত্র ১ বছর সময়ের মধ্যে তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে। তারপর ড. নজরুল ইসলাম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে তা দেখতে দেখতে এক বছরের বেশি সময় খেয়ে ফেলেন। এরপর সচিব কমিটিতে এসে এমন আটকা পড়ে যে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আর মন্ত্রিপরিষদ কমিটি ও জাতীয় সংসদ দেখার সৌভাগ্য হলো না। এমন লালফিতার দৌরাত্ম্য সরকার দেখাতে চাইলে এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। এখানে কমিশন সদস্যদের একটা ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় জরুরীও বটে। কারণ শিক্ষানীতি না থাকার কারণে দেশের যথাযথ মানবসম্পদ পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। দেশের সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাটাই স্বপ্নে পাওয়া মনে হয়। যে যেভাবে পারে সেভাবেই পরিচালনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। প্রতিটা শিক্ষা কমিশন কাজ করার সময় আমরা দেখি স্বপ্নে পাওয়া ওষুধের কোন অভাব নেই। পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং সিস্টেমে হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও যুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে। কওমি দাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমানের করে দেয়া হচ্ছে। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে একমুখী করা হচ্ছে। অনার্স কোর্সকে ৪ বছরের করে দেয়া হচ্ছে। কাঠামোবদ্ধ বা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। শিক্ষা কমিশন ক্রিয়াশীল থাকা অবস্থায় তাদের অন্ধকারে রেখে সরকার অনেকটা গোপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যক্রম চালু রাখে।

সরকারের এমন সব কর্মকাণ্ড দেখে শিক্ষা কমিশন নিয়ে ভাবনার কোন অবকাশ আছে বলে মনেই হয় না। সরকার ঠিক করেই রেখেছে শিক্ষা কমিশন করতে হয় তাই রুটিন ডিউটি হিসেবে করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এর বাস্তবায়ন তারা হয়তো করবে না। যদি ধারণাটা ভুল বলে মনে হয় তাহলে স্বাভাবিক প্রশ্ন এসে যায় দেশে এতগুলো শিক্ষা কমিশন হওয়ার পরও আমরা জাতি হিসেবে শিক্ষানীতিহীনভাবে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম কেন ? বা সরকার নিজ উদ্যোগে শিক্ষা কমিশন গঠন করার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থা, পদ্ধতিগত পরিবর্তন ও সম্প্রসারণে নিবেদিত থাকে কেন ? শিক্ষা কমিশন কি রিপোর্ট দেয় তা দেখার ন্যূনতম কোন প্রয়োজন অনুভব করে না কেন ? দেশের রাজনীতিবিদরা কি দেশের শিক্ষাবিদদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না ? তারপরও অনেক প্রশ্নের জবাব অমীমাংসিত রেখে সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই দেখা যায় শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হতে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আর কতদিন বাঙালি বয়ে বেড়াবে তাই এখন দেখার বিষয়।

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি বহুবার বদলানো হয়েছে। গিনিপিগের চেয়ে খারাপ অবস্থা। এখনও প্রতিনিয়ত বদলানো প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। শিক্ষা সংস্কারের নামে নিয়ম পদ্ধতির পরিবর্তন-পরিবর্ধন চলছে– চলবে বলে জনগণ ধরে নিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মূল কাজ হলো বিদ্যা দান ও গ্রহণ তাই মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক। আর বিশেষ কারণে আবশ্যক হলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ থাকা প্রয়োজন। স্বপ্নে পাওয়া ব্যবস্থাপনার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। পত্রিকান্তরে প্রকাশ বর্তমান শিক্ষা কমিশন খসড়া প্রণয়ন করে এখন রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের কাজ করছে। দেশের মানুষকে নতুন কিছু দেয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবার পুরনো বিষয়ের অবতারণা করেছে। দেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৮ বছর করা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ ৯-১২ শ্রেণী করা। স্বাধীনতার পর প্রথম শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও এমন ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। ৩৫ বছর পর নতুন করে সুপারিশ আসছে। ৩৫ বছরের পুরনো একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন রাখা শোভন কিনা তাও জানি না। তারপরও জানতে ইচ্ছা হয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন আনা হলে সাধারণ মানুষের কি কি উপকার হবে ?

সরকার ১৯৯৩ সালে দেশের সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করা হলে তা বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকারের ওপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ আসবে–তা সহ্য করতে পারবে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হলেও অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি একটা কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। বিতর্কের খাতিরে বিদেশী ঋণে অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিবেচনায় না আনলেও মানসম্মত শিক্ষক সমস্যা সমাধান কঠিন কাজ। নতুন শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি পুরনোদেরসহ সব শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এমন বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে সরকারকে ফেলে দিয়ে শিক্ষা কমিশন জনগণের কি উপকার করতে চায় ? তার ওপর বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা মান অর্জন করতে পারছে না। তৃতীয় শ্রেণী পাস করার পর প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী স্বাক্ষরবিহীন বা প্রাকস্বাক্ষর থেকে যাচ্ছে। আবার ৫ম শ্রেণী পাস করার পর এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী ন্যূনতম সাক্ষরতা দক্ষতা লাভ করতে পারছে না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য যে ৫৩টা প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করেছে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষেও তার অর্ধেক শিক্ষার্থী সেগুলো অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। দেশের এমন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিরাজমান থাকা অবস্থা পরিবর্তন করা কি খুব জরুরি ?

দেশে এখনও ১০ শতাংশ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। যে শিশু আসছে তার প্রায় ৪০ শতাংশ বিদ্যালয়গুলো থেকে ঝরে পড়ছে। সব মিলিয়ে ৫০ শতাংশ শিশু বঞ্চিত হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। দারিদ্র্যের কারণে শিশুরা ভর্তি হয় না বা ঝরে পড়ে এটা যেমন সত্য বিপরীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যাও কম নেই। বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয় ভিত্তিক ও দক্ষ শিক্ষকের মারাত্মক ঘাটতি ও শিক্ষকদের বেতন সমস্যা রয়েছে। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ ও খেলার উপকরণের সঙ্কট রয়েছে। এক বেঞ্চে ৬-৭ জন গাদাগাদি করে বসতে হয়। সহ পাঠ্যক্রমিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। খাবার পানি, টয়লেট ও খেলার মাঠের সমস্যা আছে। এছাড়াও সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের শিক্ষার পেছনে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি, না কি পরিবর্তন জরুরি?

বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে দেশে শিক্ষার নামে প্রহসন চলছে। মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ হিসেবে শিক্ষার দিক দিয়ে যতটা অগ্রসর হওয়ার কথা তা আমরা পারিনি। তার মূল কারণ আমাদের জনসংখ্যাকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য যে ত্যাগ, পরিশ্রম ও সদিচ্ছার প্রয়োজন তার সীমাহীন অভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বর্তমান। শিক্ষক রাজনীতি ও ছাত্ররাজনীতি শিক্ষাক্ষেত্রে ক্যান্সারের মতো কাজ করছে। সরকারি এবং বেসরকারি আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শিক্ষার একটা ন্যূনতম মান অর্জন জরুরি। অথচ শিক্ষা কমিশন পরিবেশ পরিস্থিতি উন্নত করে মান অর্জনের চাইতে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী করার সুপারিশ করছে। দেশে চলমান প্রাথমিক শিক্ষাকে এক ধারায় এনে তার মধ্য থেকেই শিক্ষার্থীদের ৮০-৯০ শতাংশ মান অর্জনের পরই পরিবর্তন বিবেচনার দাবি রাখে। তার আগে কোনভাবে বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাহত করা ঠিক হবে না।

বর্তমান শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিবর্তনের সুপারিশ রাখছে। আগামীতে মাধ্যমিক শিক্ষা হবে ৯-১২ শ্রেণী। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন পড়বে না তবে শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ সমস্যায় পড়বে মাধ্যমিক শিক্ষা। মধ্যম মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য যে সব বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বর্তমানের মাধ্যমিকের পর তাও বাধাগ্রস্ত হবে। শিক্ষার্থীরা সবাই নিজেদের শেষ চেষ্টা করার পর যখন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হবে তখন তা জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আশাবাদী মানুষের আশার পেছনে ছোটার কারণে শিক্ষা জীবনে ২ বছরের শিক্ষা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তার ওপর মাধ্যমিক শিক্ষাকে একমুখী করার একটা সিদ্ধান্ত এখনও সরকারের আছে। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান শিক্ষা যেভাবে পিছিয়ে পড়ছে তাতে পরিবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা ইঞ্জিনের কাজ করবে কিনা ভাবা প্রয়োজন।

বাঙালি রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে জানে না বোধ করি। আজও শিক্ষার মাধ্যম বাংলায় করা সম্ভব হয়নি। বাংলায় পাঠ্যবই পাওয়া যায় না স্বাধীনতার পর থেকে শুনতে হচ্ছে একই কথা আমাদের বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, ইত্যাদি বিশিষ্টজনরা বোধকরি নিজেদের মনোভাব বাংলায় প্রকাশ করতে পারেন না। তা না হলে ৩৮ বছরে এমন সমস্যা থাকার কথা নয়। তারপরও শিক্ষা কমিশনের কঠোর মনোভাব এ সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। সরকার উদ্যোগী হলে বাংলায় সব শ্রেণীর পাঠ্যবই পাওয়া সম্ভব। আগামী ১০ বছরের জন্য একটা প্রকল্প গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দোভাষী নিয়োগ করে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে একটা পথ পাওয়া যাবে। শিক্ষার মাধ্যম বাংলায় করতে এই উদ্যোগ চলমান রাখা গেলেই শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ সহজ হয়ে যাবে, যা মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তা দেবে। এখন আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিনটা মূল ভাষা শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং ধর্মীয় কারণে আরবি। জানি না বিশ্বের শিশু শিক্ষার দর্শন এই বিষয়টা অনুমোদন করে কিনা ? তবে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই ভাষার শিক্ষার চাপ। বিশ্বের মাত্র ১০ ভাগ মানুষ ইংরেজি জানে। অন্যদিকে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটা স্তরে ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষার্থীরা খারাপ ফলাফল করার কারণে সার্বিক পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হচ্ছে না। শিক্ষা কমিশন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব প্রদান করে সুপারিশ করলে সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যা খাপ খায় না, তা যদি আন্তর্জাতিকতার নামে শিক্ষা কমিশনের পছন্দ হয় তাহলে চরম বিপত্তি অনিবার্য। বহমান শিক্ষা ব্যবস্থার এখনই পরিবর্তন দেশে এক সাংস্কৃতিক সঙ্কট সৃষ্টি করবে, যা আমদানি করা তত্ত্ব দিয়ে ভরাট করা যাবে না। আমাদের চলার পথ পায়ের নিচের মাটি দিয়েই তৈরি করতে হবে। অন্য কোন গ্রহ থেকে উড়িয়ে আনলে চলবে না। পরিবর্তনকে প্রগতিবিরোধী বলে হটিয়ে দিয়ে শূন্যতার সৃষ্টি করতে চাই না, তবে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করার প্রাথমিক কাজ শেষ না করে পরিবর্তনের ঢক্কানিনাদে গগন ফাটিয়ে প্রচার করলে লাভ হবে না।